আধ্যাত্মিক পথে বিজ্ঞানী

প্রব্রাজিকা পরমপ্রাণা

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ছোট শহর বিষ্ণুপুর। এখানকার সুন্দর টেরাকোটার মন্দিরগুলি এখনও তাদের প্রসিদ্ধি বজায় রেখেছে। এই শহরেই ১৮৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন বশীশ্বর সেন।

সেযুগে যে-কয়েকজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, রামেশ্বর সেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি দরিদ্র ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। তাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনেরও চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাঁর সহধর্মিণী প্রসন্নময়ী এসব কাজে তাঁর সহযোগিতা করতেন। এই দম্পতির পাঁচ পুত্রের মধ্যে বশীশ্বর ছিলেন চতুর্থ। এছাড়াও বশীর দুই দিদি ছিলেন। সকলেই বশীশ্বরকে বাড়িতে 'বশী' বলে ডাকতেন।

রামেশ্বর ছিলেন সংস্কৃত ও গণিতে সুপণ্ডিত। বশীর কোষ্ঠী বিচার করে তিনি চমৎকৃত হন। তাতে লেখা ছিল, জাতক অত্যন্ত মেধাবী ও পুরাকালের ঋষিদের মতো আধ্যাত্মিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু পুত্রের এ-হেন যশোলাভ দর্শনের পূর্বেই পিতা-মাতা ইহলোক ত্যাগ করবেন। বশীর ভবিষ্যৎ জেনে পিতা আনন্দিত হলেও পুত্রের এই কীর্তি দর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন জেনে দুঃখিত হলেন।

বশী আট-নয় বছর বয়স থেকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় হাত দিয়েছিলেন। এই গবেষণাকার্যের প্রথমেই বলি হল পিতার অতি সাধের সোনার ঘড়িটি। ঘড়ির টিকটিক শব্দ, কাঁটা দুটির ধীর সঞ্চালন বশীর মনকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। ঘড়ির উজ্জ্বল বর্ণ ও স্বর্ণনির্মিত গোলাকার গঠন তাকে তত আকৃষ্ট করেনি, বরং ভেতরের কোন শক্তিতে ঘড়িটি চলছে দেখার জন্য তার মন ছিল ব্যাকুল। একদিন বাবার অনুপস্থিতিতে বশী খুব সাবধানে তার ছোট ছোট হাত দিয়ে ঘড়ির ছোট ছোট স্ক্রুগুলো খুলে প্রত্যেকটি ভাগ আলাদা আলাদা করে কাগজের উপর সাজিয়ে রাখল। বাবা ফিরে এসে এই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গিয়ে 'কে করেছে' চিৎকার করাতে পেছন থেকে শোনা গেল শিশুর কোমল কণ্ঠস্বর। খুব গর্বের সঙ্গে বশী বলছিল, ''আমি বাবা, আমি। কারও সাহায্য ছাড়াই আমি এটাকে খুলে রেখেছি।''

রামেশ্বরের দুই পুত্র সুরেশ্বর ও গুণেশ্বর পড়াশোনায় বাবার মনোমতো সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। সুরেশ্বর অলস প্রকৃতির হলেও পরবর্তী কালে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করে

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে 'ভক্ত সুরেশ্বর সেন' নামে পরিচিত হন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে ভক্তিপরায়ণতার জন্য 'দ্বিতীয় গিরিশ' বলে উল্লেখ করতেন।

বশীর আনন্দের দিনগুলি তার বারো বছর বয়সেই বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে রামেশ্বর গত হলেন। পরিবারে দুঃখ-দুর্দিনের শুরু হল। বশীর পড়াশোনাও এখানেই সাঙ্গ হল। প্রথমে বশী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর মনঃকষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করলেও সমবয়সী অন্যান্য ছেলেদের মতো স্কুলে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তার মন অত্যন্ত বেদনার্ত হচ্ছিল। বাবা তার বিদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে সর্বদা যত্নশীল ছিলেন। সেইসব কথা মনে করে বশীর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। শেষে নানাদিক চিন্তা করে বিষ্ণুপুর থেকে কুড়ি মাইল দূরে বাদুলগ্রাম নিবাসী দিদির সাহায্যে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে মনস্থ করল সে। মা জানলে অতদূরে পাঠাতে রাজি নাও হতে পারেন, এই আশঙ্কায় বশী একদিন সকালে রান্নাঘরে কর্মরত মাকে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পরবর্তী কালে বশী যখন বিষ্ণুপুরে ফিরে আসে তখন ছেলেকে স্বাগত জানাতে মা আর বেঁচে নেই।

রাস্তায় চলতে চলতে নিজের জুতোর দিকে নজর পড়ায় বশীর চিন্তা হল, এই জুতো যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে দিদির শ্বশুরবাড়িতে জুতোর জন্য হাত পাততে হবে। এই ভেবে জুতো জোড়া হাতে নিয়ে বশী আবার চলতে শুরু করল। পথে এক পুরোনো পরিচারিকাকে দেখে বশী মাকে জানিয়ে দিতে বলল যে সে দিদির বাড়ি যাচ্ছে। আগে বশী বহুবার এই রাস্তা দিয়ে যাত্রা করেছে। তখন গোরুর গাড়িতে নরম আসনে বসে নানা মুখরোচক খাবার খেতে খেতে বাবা-মার সঙ্গে গল্প করতে করতে গেছে। এখন সেই ছেলেই নগ্নপায়ে অভুক্ত অবস্থায় রাস্তার ধুলোয় দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। জামার পকেটে তার শুধু কিছু খুচরো পয়সা। তাই দিয়ে রাস্তার পাশের দোকান থেকে সে একটু গুড়-মুড়ি কিনে নিল। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বশী দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভয়ে ও ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে গোরুর গলার ঘণ্টির ঠুংঠুং আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেল বশী। গোরুর গাড়িতে বাবার পরিচিত এক ভদ্রলোক বশীকে দেখে কাছে ডাকলেন এবং সব ঘটনা শুনে শীঘ্র দিদির বাড়ি পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু বাদুলগ্রামে ভাল স্কুল না থাকায় দিদি তাকে অপর এক দিদির বাড়ি রাঁচিতে পাঠান। সেখানেই বশী তার স্কুলের পাঠ শেষ করে।

১৯০৭ সালে বশী কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়। ১৯০৯ সালে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় বন্ধু বিভূতি ঘোষের সঙ্গে গঙ্গা পার হয়ে তার প্রথম বেলুড় মঠে যাওয়া। বিভূতি স্বামীজীর ঘরের নিচে একতলার একটি ঘরে শায়িত একজন সন্ন্যাসীর কাছে তাকে নিয়ে গেল। তিনি ডায়াবেটিস আর হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। বিভূতি তাঁকে বশীর পরিচয় জানাল। সন্ন্যাসী বশীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রথম প্রশ্ন করলেন, ''মাথায় এত তেল ঢেলেছ কেন?'' আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, ''পান চিবুনোর অভ্যাস আছে মনে হচ্ছে...?'' এরকম আরও তিরস্কার চলতে লাগল। ''সাহেবদের মতো পায়ে বুটজুতো পরে রাস্তার নোংরা মাড়িয়ে মাড়িয়ে এই পর্যন্ত এসেছ? স্বামী বিবেকানন্দের রক্ত দিয়ে এই স্থান তৈরি হয়েছে...।'' বকুনির বৃষ্টিপাত হল। বশী চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিল। ভাবছিল, ''আমি যদি এত সব জানতাম তবে আপনার কাছে আসার দরকার কী ছিল?''

পরে বশী জানতে পারল, তিনি স্বামী সদানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য।

আর একবার কলেজ ছুটির দিনে বিভূতি ও বশী বেলুড় মঠে গেল। স্বামী সদানন্দের ঘরের বাইরে জুতো খুলতে খুলতে বশীর কানে গেল তিনি বিভূতিকে বলছেন, ''ও বিভূতি, তোমার বন্ধু কেমন আছে? সেদিন আমি বকুনি দিয়েছি—রাত্রে আমার ঘুম হয়নি।'' এবার তিনি বশীর সঙ্গে খুবই স্নেহপূর্ণ ও দয়ার্দ্র ব্যবহার করলেন। ''ভাই তুমি তামাক খাবে?'' বশী ''হ্যাঁ'' বলাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের হুঁকোটা তাকে এগিয়ে দিলেন। সেদিন বিদায় নেওয়ার সময় স্বামী সদানন্দ বশীর চোখদুটি নিরীক্ষণ করে বললেন, ''আমি যা পেয়েছি সেসবই এখন থেকে তোমার।''

বশীর সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই মুহূর্ত থেকে সে স্বামী সদানন্দকে গুরুরূপে স্বীকার করল।

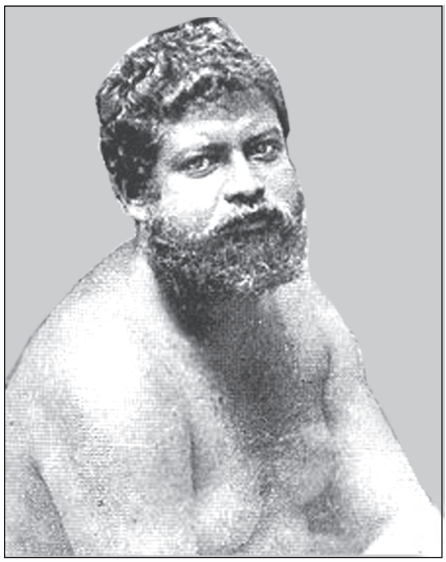

স্বামী সদানন্দ

বশী এখন যুবক। গরমের ছুটিতে বিষ্ণুপুরের বাড়িতে থাকাকালীন ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলেন : ''বশী, সদানন্দের শরীর খুব অসুস্থ, সেবা করার লোক নেই, তুমি শীঘ্র কলকাতায় ফিরে এসো...।'' বশী চিন্তায় পড়লেন। তিনি এখনও ছাত্র, বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতিও ভাল নয়, কিন্তু নিবেদিতার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারলেন না।

ইতিমধ্যে নিবেদিতা বাগবাজারে তাঁর স্কুলের কাছে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে অসুস্থ সদানন্দকে রেখে সেবার ব্যবস্থা করলেন। বশী স্বামী সদানন্দের কাছ থেকেও পত্র পেলেন। ৩।১০।১৯০৯ তারিখের ওই পত্রে তিনি লিখেছেন, ''প্রিয় বশী, ভগিনী একটি ভাড়াবাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। আমি খুব দুর্বল হয়ে গেছি, নিজে নিজে ওই বাড়িতে যাওয়ার শক্তিও আমার নেই। তুমি কবে এখানে এসে আমায় নিয়ে যাবে?—ইতি সদানন্দ।''

বশীশ্বর ও তাঁর ভাই মতীশ্বর (যাঁকে সবাই 'টাবু' বলে ডাকতেন) দুজনে মিলে সদানন্দজীকে ওই বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ওখানে দুজনেরই জীবনে এমন অনেক অভিজ্ঞতা হল যা অবিস্মরণীয়। সদানন্দজী তাঁদের সেবা গ্রহণ করলেন, প্রতিদানে তাঁদেরকে অধ্যাত্মপথের সন্ধান দিতে আগ্রহী হলেন। অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে বশী এবং টাবুর কোনও ধারণা ছিল না; তাঁরা শয্যাশায়ী এক সাধুর সেবার উদ্দেশ্যেই সেখানে গিয়েছিলেন। সেদিন থেকে পরবর্তী দুবছর দুই ভাইয়ের অকল্পনীয় শিক্ষা আরম্ভ হল। সদানন্দজী বুঝেছিলেন, তিনি আর বেশিদিন ইহজগতে থাকবেন না। তাই ভালবেসে তাঁদের দুজনকে বোঝানোর সময় তাঁর ছিল না। তিনি এই স্বল্প সময়ে দুই তরুণের পুরনো সংস্কার দগ্ধ করতে চাইলেন। ভাড়াবাড়িটি ছিল বাগবাজার পল্লির বোসপাড়া লেনে। বাড়ির সদর দরজার বাইরে দুদিকে ছিল পাথরের রোয়াক। সন্ধ্যাবেলা পাড়ার কেউ কেউ সেখানে বসে গল্পগুজব করতেন। যাঁরা

রোয়াকে বসতেন শুধু তাঁরাই নয়, আশেপাশের বাড়ির মানুষও এই বাড়ি থেকে হঠাৎ বকুনি ও চিৎকারের শব্দ শুনতে পেতেন। টাবুর কোনও কাজই সদানন্দের মনের মতো হত না, কাজের ত্রুটিগুলি দেখিয়ে তিনি টাবুকে তিরস্কার করতেন। বশী রাত্রে সেবা করে সকালে কলেজে যেতেন। টাবু পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই সারাদিন বাড়িতে থেকে স্বামী সদানন্দজীর সেবা করতেন।

শয্যা থেকে ওঠার সামর্থ্য ছিল না সদানন্দজীর। টাবু সারাদিন তাঁকে বাতাস করতেন—প্রচণ্ড গরমে বরফ নিয়ে এসে তাঁর শরীর ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করতেন। বশীর মতো টাবুর প্রখর বুদ্ধি ছিল না, মাঝে মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় দুই ভায়ের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যেত। বশী রাগ করে একদিন সদানন্দজীকে বললেন, ''টাবুর সঙ্গে আমার কাজ করা সম্ভব নয়।'' তৎক্ষণাৎ সদানন্দজীর উত্তর এল, ''প্রথমে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। ও একটা বলদ হতে পারে, কিন্তু তুমি নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে কী করছ নিজে চিন্তা করো।'' সেইদিন থেকে তাঁদের কলহের ইতি হল।

বশীদের কাছে টাকা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যেরা মাঝে মধ্যে অর্থসাহায্য করতেন। বশীর ছোটদাদা পুলিশে কাজ করতেন, তিনিও মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতেন। বশী ও টাবু নিজেদের কথা ভুলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সদানন্দ মহারাজের সেবা করতেন। একবার কোনও ভক্ত না আসায় যৎসামান্য প্রণামীও পাওয়া গেল না। হাতের সামান্য অর্থও নিঃশেষপ্রায়। টাবুর সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কিন্তু বশীকে আর্থিক অনটনের চিন্তা সর্বদা পীড়িত করত। একদিন রাত্রে পরের দিনের চিন্তা করতে করতে একটি সাদা কাগজ হাতে নিয়ে ব্যাঙ্কের চেক লেখার মতো তার উপরে লিখে ফেললেন—''বিবেকানন্দের ব্যাঙ্ক ২০০/-''। পরের দিন সকালে সদর দরজায় আওয়াজ শুনে বশী দরজা খুললে এক পরিচিত ব্যক্তি ঠিক দুশো টাকা সদানন্দজীর প্রণামী বাবদ বশীর হাতে দিলেন। বশী বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। সেদিন বশীর মুখের ভাব লক্ষ করে সদানন্দ মহারাজ বললেন, ''কী হয়েছে বশী? আজ তোমার কথাবার্তা কিছু অন্যরকম দেখছি!'' যখন বশী আনুপূর্বিক ঘটনা তাঁকে জানালেন, তখন তিনি তিরস্কার করে বললেন, ''লজ্জা করছে না তোমার? কী হীনবুদ্ধি! স্বামীজীর কাছে ত্যাগ-বৈরাগ্য চাওয়ার বদলে টাকা চেয়েছ?'' পরে মহারাজ স্বামীজীর জীবনের গল্প শোনালেন। স্বামীজী তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সংসারের প্রবল অর্থকষ্টের কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাতে মন্দিরে মা ভবতারিণীর কাছে পাঠালেন, কিন্তু স্বামীজী অর্থের

কথা ভুলে শুধু জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের জন্য প্রার্থনা জানালেন। মহারাজ আরও বললেন, গুরুকৃপায় নরেন্দ্রের মাকে রাস্তায় নেমে ভিক্ষা করতে হয়নি, ঠাকুর নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

বশী আর কোনওদিন ধন-সম্পত্তির জন্য প্রার্থনা করেননি। কিন্তু গুরুকৃপায় তাঁকেও আর কোনওদিন কোনওরকম অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

বশী নিজের বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, তবু একবার কথাপ্রসঙ্গে সদানন্দজীকে বলে ফেললেন, ''আমাদের জন্য বাবা কিছু রেখে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পরে আমরা অনাথ হয়ে গেছি।'' ''বাবার বিরুদ্ধে একটিও কথা বলবে না''—স্বামী সদানন্দ গর্জন করে উঠলেন। ''তিনি তোমাকে সুস্থ শরীর দিয়েছেন, বিদ্যাবুদ্ধি দিয়েছেন, এর বেশি আর কী আশা কর?'' সেই রাত্রে বশীর মাথায় হাত রেখে মহারাজ সুললিত কণ্ঠে একটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন :

''কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ,
কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্॥''

—অর্থাৎ তুমি কে, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কে আমার জননী, কে আমার পিতা?—এইরূপ বিচার দ্বারা স্বপ্নসদৃশ বিকার-স্বরূপ জগতকে ত্যাগ করে সমস্তই অসার বলে ধারণা করো।

সদ্‌গুরু যেন-তেন-প্রকারেণ মুক্তিপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। এমন গুরুর হাতে তৈরি হওয়ার জন্য শিষ্যেরও বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রয়োজন। বশীও বিশ্বাস ও শরণাগতি সম্বল করে নিজেকে এই শিক্ষায় সম্পূর্ণ সমর্পিত করেছিলেন।

মহারাজের খাটের পাশে বশী মেঝেতে শুতেন। একদিন ভোর তিনটের সময় মহারাজ জল চাইলেন। বশী রাত্রে ঘুমালেও রোগীর সেবায় সর্বদা সচেতন থাকতেন। কিন্তু সেদিন তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অভ্যাসবশে উঠে জলের গ্লাসটা এগিয়ে ধরলেন, কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব থাকায় একটু জল ছিটকে পড়ে গেল। সদানন্দজী গ্লাসের পুরো জলটা বশীর মুখের উপর ঢেলে দিয়ে বললেন, ''এখন থেকে আমাকেই তোর সেবা করতে হবে মনে হচ্ছে। জীবনটা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিবি?''

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলা গল্পগুলি সদানন্দজী এই দুই তরুণ সেবককে বলতেন—নিষ্ঠাভরে সংসারের কর্তব্য করে চাষি কীভাবে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেছিল, এক গোয়ালিনি কীভাবে নামের শক্তিতে বিশ্বাস করে হেঁটে নদী পার হয়েছিল। মানুষের দুঃখের মূলে আছে অহংকার। 'প্রভু আমি নই—কেবল তুমি তুমি' বলে নম্র না হওয়া পর্যন্ত কত যাতনা সহ্য করতে হয়! অহংনাশের জন্যই যে অনেক দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে হয় এটি দৃঢ়ভাবে ধারণা করানোর জন্য সদানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত উপমাগুলি বিশদভাবে তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন।

সদানন্দজী একদিন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে সাহেবদের খাবার কিনে আনতে বললেন। নানারকম খাদ্যদ্রব্য এনে সেগুলি একটি বড় থালায় সাজিয়ে তাঁর সামনে রাখা হল। তিনি থালাটি একবার নিরীক্ষণ করে বশীকে বললেন, ''এবার শুরু করো।'' বশী ঘাবড়ে গেলেন। থালার মাংস গোমাংস হতে পারে ভেবে বশী সংশয়ান্বিত ছিলেন। সদানন্দজী জোর দিয়ে বললেন, ''ধর্ম রান্নার হাঁড়িতে নেই! তা আছে আমাদের অন্তরে। ধর্ম গুটিকতক আচার-আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তা মানুষের পূর্ণতার বিকাশ। শাস্ত্রে, পূজাপদ্ধতিতে ধর্ম নেই—বৌদ্ধিক তর্কযুক্তির মধ্যেও নেই।'' এই বলে তিনি স্বামীজীর জীবনের কিছু ঘটনা বশীকে শোনালেন।

সেইসময় বাংলাদেশের যুবকরা মনে তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। বশীও ব্যতিক্রম ছিলেন না। বশীর এই মনোভাব সদানন্দজী লক্ষ করেছিলেন। একদিন তিনি বশীকে প্রশ্ন করলেন, ''আমাদের দেশে ব্রিটিশ নাগরিকের সংখ্যা কত?'' ''পঞ্চাশ হাজার হতে পারে।'' উত্তর শুনে মহারাজ আবার প্রশ্ন করলেন, ''আমরা ভারতীয়রা কজন আছি?'' উত্তর এল—''তিরিশ কোটি।'' এবার গম্ভীরভাবে সদানন্দজী বশীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ''এখন বলো আমাদের দাসত্বের কারণটা কী? ব্রিটিশদের শক্তি না আমাদের দুর্বলতা?'' বশী নিরুত্তর রইলেন। খুবই আবেগের সঙ্গে মহারাজ বললেন, ''মনকে দৃঢ় করো বশী। দেশকে চিরন্তন কিছু দাও। এদের ওদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে কোনও লাভ নেই।''

মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ সতর্ক করে দিয়েছিলেন, রাজনীতির সঙ্গে কোনওরকম সংস্রব যেন না থাকে। স্বামীজী স্বদেশের তরুণ-সমাজের কাছে কী প্রত্যাশা করতেন তা সদানন্দজী বশীকে বুঝিয়ে বললেন।

বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে সদানন্দজী কিছুদিন বাস করেন। সেইসময় তিনি একবারের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের চরণবন্দনা করে সদানন্দজীর শরীর ও মন অপূর্ব পবিত্রতায় ভরে উঠেছিল। এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর একবার সেই পবিত্রতায় স্নাত হওয়ার জন্য মন তাঁর আকুল হয়ে উঠল। এই প্রার্থনা জানিয়ে তিনি স্বামী সারদানন্দকে সংবাদ পাঠালেন। এই সংবাদ শ্রীশ্রীমায়ের কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তিনি স্বয়ং সদানন্দজীর বাড়ি এলেন। সদানন্দজী হাতজোড় করে করুণকণ্ঠে বললেন, ''মা, পূর্বে একবার আমায় কৃপা করেছেন, সেইভাবে এখন আর একটিবার আপনার কৃপাভিক্ষা করছি।'' শ্রীশ্রীমা বললেন, ''বাবা, ঠাকুর তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন।'' সদানন্দজী মস্তকে মায়ের পাদস্পর্শ পাওয়ার জন্য আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীমাকে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হল। সদানন্দজীর মনও শান্তিতে পূর্ণ হল। বললেন, ''এবার যাত্রা করার টিকিট পেলাম।'' এর কিছুদিন পরই—১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১১—তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সকলের মনে হল, বশী ও টাবু অনাথ হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁরা তো গুরু সদানন্দের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। জন্ম-মৃত্যুর পারে আছেন অমর আত্মা। তিনি দেহ নন, মন নন। শরীর তো দুদিনের। গুরু সদানন্দ তাঁর শিষ্যদের আনন্দের খনির সন্ধান এইভাবে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ভগিনী ক্রিস্টিন মাঝে মাঝে স্বামী সদানন্দকে দেখতে আসতেন। তিনি দেখেছিলেন কত প্রীতি ও ভালবাসা নিয়ে বশী ও তার ভাই স্বামী সদানন্দের সেবা করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ''গুরু-শিষ্যের ভাবটাই ওখানে ছিল না। স্বামী সদানন্দ স্বয়ং গুরু বিবেকানন্দের কাছে যে-শিক্ষা পেয়েছিলেন সেসবই এই দুবছরে শিষ্যদের দিয়ে গেছেন। বশীর মধ্যে সেই ভাবটাই ভরপুর রয়েছে বলে দেখতে পাচ্ছি।'' সদানন্দজী তাঁর এই তরুণ শিষ্যদের বলতেন, ''আমি কেবলমাত্র একটা কাজ তোমাদের জন্য করতে পারি। স্বামীজীর কাছে তোমাদের নিয়ে যেতে পারি।'' তাঁরা প্রত্যুত্তরে বলতেন, ''তাহলেই হবে, আমাদের আর কিছু চাই না।'' তাঁরা দুভাই খুবই আনন্দে ছিলেন কিন্তু বাইরের লোকে ভাবত তাঁরা খুব কষ্টে আছেন। তারা দুঃখ করে বলত, ''গুরুর চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে এই দুই বেচারির কী কষ্টের জীবন!''

সদানন্দজীর দেহত্যাগের পর বশী একদিন শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে শ্রীশ্রীমার সাক্ষাতেই স্বামী সারদানন্দজী বললেন, ''বশী, সদানন্দ তোমায় মন্ত্রদীক্ষা দেয়নি। তুমি শ্রীশ্রীমায়ের

কাছে দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাও।" বশী নিরুত্তর রইলেন। অন্তর্যামিনী শ্রীশ্রীমা বললেন, "না, বশীর মন্ত্রদীক্ষার প্রয়োজন নেই।"

স্বামী সদানন্দজীর দুবছরের সাহচর্যে বশীর দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল—অধ্যাত্মজীবন অন্তর্মুখ। সাধকের সংগ্রাম কেবলমাত্র নিজের অন্তরের অহংকার ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে। স্বামীজী মানুষের এই আত্মজাগরণের জন্য পৃথিবীর বহুপ্রান্তে পরিভ্রমণ করেছেন ঝড়ের মতো। সারা বিশ্বের চিন্তাজগতে এক বৈপ্লবিক নবজাগরণ এনেছেন।

স্বামী সদানন্দজীর দেহত্যাগের পরেও বশী তাঁর পূতস্মৃতি বিজড়িত বাড়িটিতে থেকে গেলেন। ভগিনী নিবেদিতা আগের মতোই বাড়িভাড়া দিচ্ছিলেন। বশীশ্বর বি এস সি পাশ করে এম এস সি-তে যোগদানের চেষ্টা করছিলেন। বশীর বাড়িতে মাঝে মাঝেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীরা আসতেন। তাঁদের মধ্যে বশীর সমবয়সী ব্রহ্মচারীদের কেউ কেউ তাঁকে বলতেন, "বশী, সবসময় মাইক্রোস্কোপ নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। এ-জীবনে পরমার্থ কিছু পাওয়ার চেষ্টা করো।" বশীও সংশয়ান্বিত হয়ে পড়লেন। শেষপর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বাড়ির কাছেই বলরাম বসুর বাড়িতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গেলেন। বশীকে দেখামাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন, "বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলো আমাদের একটু বুঝিয়ে বলো দেখি।" বশী ইলেকট্রন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলেন এবং বর্তমানে নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা সমাজ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে তার বিবরণ দিলেন। বশীর মুখে সব শুনে ব্রহ্মানন্দজী বশীকে বললেন, "তুমি বিজ্ঞানচর্চায় আরও এগিয়ে যাও, এর দ্বারা তুমি সব পাবে।" বশীর মনের দ্বন্দ্ব দূর হল এবং তাঁর জীবনের পরবর্তী পথের দিঙ্‌নির্ণয়ও হয়ে গেল।

জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে বশীর পরিচয় করিয়ে দেন ভগিনী নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র সেইসময় দেশে বিদেশে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ২১ অক্টোবর ১৮৯০ ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে নিজ গবেষণা সম্বন্ধে ভাষণ দেওয়ার পর থেকেই বিদেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছিলেন। তিনি সারা বুল ও ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "জড় পদার্থেরও প্রাণ আছে। চৈতন্য সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে রয়েছে। প্রথমে উদ্ভিদের মধ্যে, পরে পাথর ও লোহার মধ্যেও প্রাণ আছে এটা আমি প্রমাণ করে দেখাব।"

১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র কলকাতার গভর্নরের সামনে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গগুলির শক্তি দেখালেন। এই তরঙ্গ একটি পুরু দেওয়ালের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে অপরপ্রান্তের একটি ভারি বস্তুকে নাড়িয়ে দিল। তরঙ্গের দ্বারা ঘণ্টা আপনা-আপনি বেজে উঠল। এরপর তিনি একটি বন্ধ ঘরের মাটির নিচে রাখা ছোট বোমার বিস্ফোরণ ঘটালেন।

জগদীশচন্দ্রের ছাত্র হিসাবে বশী যখন যোগদান করেন তখন বোস ইনস্টিটিউট ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ছোট্ট ঘরে কেবলমাত্র পাঁচ জন ছাত্রকে নিয়ে জগদীশচন্দ্র নিজের গবেষণাগার শুরু করেছিলেন। সেইসময় তিনি পদার্থবিজ্ঞান ছেড়ে উদ্ভিদবিজ্ঞানের উপর গবেষণা করতেন—উদ্ভিদের

মধ্যে প্রাণশক্তির অন্বেষণে রত ছিলেন। উদ্ভিদের সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াগুলি অনুধাবনের জন্য তিনি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে প্রাণীর শরীরে যেমন প্রতিক্রিয়া হয় তেমনি গাছের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া হয়—একথাই তিনি গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করে জগতের সামনে এক বিস্ময় স্থাপন করলেন।

বশী সেন নিজের গুরু সদানন্দ মহারাজকে যে-শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন সেই একইরকম শ্রদ্ধা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকেও করতেন। জগদীশচন্দ্র এই তরুণ যুবকের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আগ্রহ দেখেছিলেন, তাই বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নৈতিক চরিত্রের উন্নতির দিকেও বিশেষ লক্ষ রাখতেন। তিনি একাধিক চিঠিতে বশীর বৌদ্ধিক ও মানসিক উন্নতির জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। বশী দিনের বেশিরভাগ সময়ই তাঁর সঙ্গে কাটাতেন। পরে তিনি এইপ্রসঙ্গে বলেছেন, ''আমি শুধু তাঁর ছাত্রই ছিলাম না, অন্যান্য সবরকম কাজও করতাম। এমনকী তাঁর জামাকাপড় ধোপাকে দেওয়ার দায়িত্বও আমার ছিল।''

জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার থেকে ফিরে বশী প্রতিদিন বলরাম মন্দিরে রাজা মহারাজের কাছে যেতেন। কোনওদিন কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে নটা-দশটা হয়ে গেলে ক্লান্ত বশী 'আজ আর যাব না' ভাবলেও কী এক অজানা আকর্ষণে তাঁর পা দুটি যেন তাঁকে বলরাম মন্দিরের দিকে নিয়ে যেত। ফিরে এসে তিনি অন্তরে গভীর প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করতেন। মহাপুরুষের সান্নিধ্য যে অমোঘ তা এই তরুণ উপলব্ধি করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগারে বশী ছিলেন প্রতিভাবান ছাত্র। যত জটিল ব্যাপার তিনি বশীকেই সমাধান করতে দিতেন। জগদীশচন্দ্র গাছের পাতায় জীবনের স্পন্দন প্রমাণ করেছিলেন। এবার এই প্রমাণিত সত্যকে জনসাধারণের কাছে পরীক্ষা করে দেখানোর জন্য বশীকে নির্দেশ দিলেন তিনি। এই গবেষণার জন্য জগদীশচন্দ্র নিজে একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। এই যন্ত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি সূঁচ ছিল, তার তলায় কালি মাখানো একটি কাচখণ্ড ছিল। পাতাটির মধ্যে যে প্রাণস্পন্দন আছে তা বোঝা যাবে যখন যন্ত্রের ভিতর সূঁচটি নড়বে এবং কালি মাখানো কাচে ছোট ছোট ফুটকি পড়বে। ফুটকিগুলিই পাতার প্রাণস্পন্দনের পরিচয় বহন করবে। এই সূক্ষ্ম স্পন্দন পরীক্ষা করার সময় প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর কাচখণ্ডটি বদলাতে হচ্ছিল। জগদীশচন্দ্রের বাড়ির দোতলার বড় হলঘরে এই গবেষণা চলছিল। সাধারণত এই ছোট পাতাটির প্রাণস্পন্দন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বন্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু সেদিন বশীর দুর্ভাগ্যের জন্যই যেন তা হল না। সারারাত্রিই পাতাটির প্রাণস্পন্দন ছিল। তা বোঝা যাচ্ছিল কাচের উপর পড়া ফুটকিগুলি দেখে। ভোর পাঁচটায় পাতাটি একটু শুকিয়ে গেছে দেখা গেল। সকাল ছটায় সূঁচটির নড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বোঝা গেল পাতার জীবনস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক সময় জগদীশচন্দ্র ঘরে ঢুকে কাচের উপর বিন্দুগুলি পরীক্ষা করে খুশি হয়ে বললেন, ''বাঃ! খুব ভাল কাজ হয়েছে বশী। এখন আমরা দেখি পাতাটিকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারা যায় কি না।''

এবার জগদীশচন্দ্রের নির্দেশমতো বশী কিছু রাসায়নিক প্রয়োগ করলেন। শুকিয়ে যাওয়া পাতাটি আবার সবুজ, সতেজ হয়ে উঠল। আগের তুলনায় যেন বেশিই স্পন্দন দেখা গেল। এইভাবে তিনি প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পাতাটি পরীক্ষা করলেন। সন্ধ্যার সময় বশীকে স্বস্তি দিয়ে পাতাটি পুরোপুরি শুকিয়ে গেল।

জগদীশচন্দ্র গবেষণা করে প্রমাণ করলেন গাছের প্রাণ আছে। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাঁর এই গবেষণার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁরা মন্তব্য করলেন, এটা ভারতীয়দের এক অলীক কল্পনা। ১৯১৪ সালে

ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্যে গিয়ে এই তথ্যটি প্রমাণ করে দেখাতে বললেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে জগদীশচন্দ্র তাঁর সহায়ক হিসাবে অনেক ছাত্রের মধ্যে বশীকেই মনোনীত করলেন। বশী ভারত থেকেই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গাছগুলি নিয়ে বিদেশে গেলেন।

লন্ডনে রয়্যাল ইনস্টিটিউট, কেমব্রিজ, ভিয়েনা, প্যারিস ইত্যাদি বহু জায়গার বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ মানুষ এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের দেখতে এবং তাঁদের গবেষণালব্ধ সত্য জানতে সমবেত হলেন। বিদ্যুৎপ্রবাহ, রাসায়নিক পদার্থ যেমন অ্যালকোহল ইত্যাদি কাচের উপর ঢেলে দিলে গাছের পাতায় যে-প্রতিক্রিয়া হয় সেটি প্রজেক্টর-এর মাধ্যমে দেখানো হল। যন্ত্রণায় গাছের পাতাগুলি কুঁকড়ে গেল, তার সতেজভাব নষ্ট হয়ে গেল। ফলে কাচের উপর ফুটকিগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে গেল। এইসবই তাঁরা পর্দায় দেখালেন। এইভাবে বশী লন্ডনের বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে পরিচিত হলেন। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক বার্নার্ড শ জগদীশচন্দ্রের সভায় এসেছিলেন। তিনি ছিলেন নিরামিষাশী। তিনি যে-সভায় যেতেন সেখানে আমিষাশীদের কটাক্ষ করার সুযোগ ছাড়তেন না। তাঁর কথাবার্তা এমনই শাণিত ছিল যে সেখানে অন্য কোনও তর্কযুক্তির অবসর থাকত না। এহেন বার্নার্ড শ-ও গাছের প্রাণশক্তির গবেষণা দেখে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন। যন্ত্রের মধ্যে রাখা বাঁধাকপির টাটকা পাতাগুলির উপর যখন বশী গরম জল ঢেলে দিলেন তখন পাতাগুলি একেবারেই কুঁকড়ে গেল, তাদের প্রাণস্পন্দন প্রায় থেমে গেল। তা দেখে জীবনে প্রথমবার এই বিখ্যাত বাগ্মী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী পরে বশীকে বলেছিলেন, ''এত বছরে এই প্রথম ওকে স্তম্ভিত হতে দেখলাম।''

জগদীশচন্দ্র বসু

বিদেশের শিক্ষিত জনগণের মুখোমুখি হতে বশী একটু ভয় পেয়েছিলেন কারণ নতুন দেশে নতুন আবহাওয়ায় ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া গাছগুলির ঠিকমতো প্রতিক্রিয়া হবে কি না তা নিয়ে তাঁর মনে সংশয় ছিল। এইসময় 'কর্মণ্যেবাধি-কারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়—গীতার এই বাণী তাঁর মনকে শান্ত ও আবেগকে সংযত করেছিল।

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বশী প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্যারিসে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা চালাবার সময় ছাত্র ও অধ্যাপকদের জগদীশচন্দ্র বললেন, ''আমরা এখন এই জীবন্ত গাছের উপর সায়ানাইড প্রয়োগ করব এবং এই গাছে যে-প্রতিক্রিয়া হবে সেটি আপনারা পর্দার উপর বিচ্ছিন্ন বিন্দুগুলি থেকে বুঝতে পারবেন।'' এরপর তিনি বশীকে সেটি প্রয়োগ করে দেখাতে আদেশ দিলেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রাখা গাছের উপর সায়ানাইড ঢালা শুরু হলে কিন্তু প্রজেক্টর-এর পর্দায় ফুটকিগুলো বিচ্ছিন্নভাবে না পড়ে সমানভাবেই পড়তে লাগল। ফলে বিষের সংস্পর্শে এলে গাছ কষ্ট অনুভব করবে এবং তার প্রাণশক্তি চলে যাবে—এই পরীক্ষায় সেই প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হল

না। বশী বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর আশঙ্কা হল, জগদীশচন্দ্র যে-পাউডার গাছের উপর ঢেলেছেন তা সত্যিই পটাশিয়াম সায়ানাইড ছিল তো? পরীক্ষা করার জন্য একটু পাউডার নিজের জিভের উপর ফেললেন তিনি, কিন্তু চিনির মতো তা গলে গেল। ওই পাউডার যদি সত্যিই সায়ানাইড হত তবে বশী যে বাঁচতেন না, সেসময় একথা তাঁর মনে ছিল না।

আসলে প্যারিসে জগদীশচন্দ্র ও বশী যে-বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়ির এক মহিলাকে তাঁরা সায়ানাইড কিনতে পাঠিয়েছিলেন। মেয়েটি ওষুধের দোকানে গিয়ে সায়ানাইড চাইলে দোকানি তা না দিয়ে চিনির প্যাকেট দিয়েছিল কারণ সে ভেবেছিল যে ওই তরুণী কোনও কারণে আত্মহত্যা করতে চাইছে। সায়ানাইডের বদলে চিনি এসেছে জেনে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতি বশী গাছের পাতার উপর অন্য একটা রাসায়নিক পদার্থ ঢেলে দিলেন; তাতে গাছের প্রাণশক্তি চলে গেল। এইভাবে দর্শকদের সামনে তিনি গবেষণার সাফল্য প্রমাণ করলেন।

বশীশ্বর সেন

জগদীশচন্দ্র এবং বশীর ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অভিযান সফল হয়েছিল। ১৯১৭ সালে জগদীশচন্দ্র একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন। তখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনে। বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছিলেন না। সেইসময় ভগিনী নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সহায়তা করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন ঠিকই কিন্তু জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ তার থেকে ভিন্ন—ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটি নিবেদিতা বুঝেছিলেন। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যময়। প্রকৃতিতে সমস্ত জীবন্ত ও জড়বস্তুগুলি একই প্রাণশক্তি থেকে নিঃসৃত ও একই প্রাণসত্তায় স্পন্দিত হচ্ছে। 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।'—এই সত্যের উপর জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁকে নিজের কাজে অগ্রসর হওয়ার সময় বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে দেখে ভগিনীর মন একইসঙ্গে দুঃখে ও ক্রোধে অভিভূত হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন। একমাত্র স্বাধীনতাই এইসব মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের অগ্রগতির রুদ্ধপথ খুলে দিতে পারে। আর তখনই কেবল ভারতের অদ্বৈততত্ত্ব, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে আবার প্রমাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। বিশ্ববাসীর চোখে পিছিয়ে পড়া পরাধীন ভারতকে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে—ভগিনীর এটি দৃঢ় ধারণা ছিল।

জগদীশচন্দ্রের লেখা Living and Non Living, Plant Response, Comparative Electro Philosophy ইত্যাদি গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলিকে সম্পাদনা করে সেগুলি ছাপার কাজে বশী

সাহায্য করেছিলেন। এইসময়ে জগদীশচন্দ্র প্রতিদিন বাগবাজারে নিবেদিতার স্কুলে যেতেন। তরুণ বশীর প্রখর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমত্তার জন্য ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে আর দশজনের চেয়ে আলাদা বলে বুঝেছিলেন। ভগিনী ১৯১১ সালে দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন। জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী বশী সেন নিবেদিতার অস্থির সামান্য অংশ এনেছিলেন, যা ভবিষ্যতে বোস ইনস্টিটিউটের নতুন বাড়িতে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একদিন বোস ইনস্টিটিউট দেখতে গিয়ে গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখেন। সেদিন সন্ধ্যায় বশী মহারাজের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন মহারাজ সমাগত ব্যক্তিদের সামনে ইনস্টিটিউটের কার্যকলাপ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণের একবার এমন অবস্থা হয়েছিল যে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন না। ঘাস না থাকা জায়গা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতেন। ঘাসের মধ্যে প্রাণ আছে এই জ্ঞান আমাদের ছিল না। আজ সকালে ড. বোসের গবেষণাগুলি দেখে, ঠাকুরের অনুভূতি কত সূক্ষ্ম ছিল তা আমি বুঝতে পেরেছি।'' এবার মহারাজ বশীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ''বশী, বিজ্ঞানের পড়াশোনা কোনওদিন ছাড়বে না। আরও এগিয়ে যাবে।'' মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ''বশী, মরবার পর কী হবে?'' বশী বললেন, ''এ-প্রশ্নের উত্তর তো আপনাকেই দিতে হবে মহারাজ, এর উত্তর বিজ্ঞানে নেই।''

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী নিজের কাজগুলি করার জন্য বশী ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে তিনি জগদীশচন্দ্রের কাছে এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য গেলেন। কিন্তু তিনি এই তরুণ বিজ্ঞানীর কথায় বিশেষ আমল দিলেন না। 'উদ্ভিদবিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি'—এই প্রকল্পটির বিষয়ে বশী জগদীশচন্দ্রের কাছে আবেদন করলেন কিন্তু এই আবেদন তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেল না। এর আগেও আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে তরুণ মেধাবী ছাত্রের বুদ্ধিমত্তাকে তিনি বিশেষ মূল্য দেননি। একবার তিনি বশীকে নিজের গবেষণা সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধ ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। তখন থেকে বশী একটুও সময় নষ্ট না করে নিজের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সময় বার করে এক বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রবন্ধগুলি প্রস্তুত করেন। যখন রয়্যাল সোসাইটি-র পত্রিকায় সেগুলি ছাপা হয়ে এল তখন পত্রিকাটি দেখে বশী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। জগদীশচন্দ্র ওই পত্রিকাতে নিজের নামের সঙ্গে এমন একজন ছাত্রের নাম যোগ করেছেন যিনি ওই গবেষণার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত ছিলেন না। বশীর নামের উল্লেখ কোথাও নেই। সেই অবস্থায় বশীর বারবার মনে পড়ল গীতার বাণী : ''কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'' এইরকম কঠিন পরীক্ষার সময় গীতার বাণী বশীকে শান্তি দিয়েছিল। ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে কথা উঠলে বশী বলতেন, ''ড. বোস তো আর স্বামী বিবেকানন্দ নন, তাই তাঁর কাছে আর কী আশা করব!''

ব্যথিত মর্মাহত বশী এরপর জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে সরে গিয়ে নিজে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার চিন্তা করতে লাগলেন। ড. বোসের সঙ্গে বারো বছরের গবেষণার জীবন কাটিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যান। বন্ধুরাও তাঁকে সাহস জোগাননি, উপরন্তু বলেন, ''হাতে যথেষ্ট পুঁজি না নিয়ে তুমি কী করে কাজে এগোতে পারবে?'' কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বশী এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

এইসময়ে বশীর মন উদ্বেগে আশঙ্কায় পূর্ণ

হয়েছিল। অর্থ নেই, আশ্রয় নেই। এতদিন যাঁকে ভেবেছিলেন বিরাট আশ্রয় তাঁর ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে যেন খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার বশীর মনে হল, জীবনের রণক্ষেত্রে এখন থেকে একা তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। তখনই মন তাঁকে আশ্বস্ত করল—''না, একা তো নই—সঙ্গে আর একজন আছেন—স্বামী বিবেকানন্দ।'' এই সংকটময় মুহূর্তে বশী যথার্থ অর্থেই স্বামীজীর শরণ নিলেন। অবশেষে ১৯২৪ সালের ৪ জুলাই একটি ছোট্ট গবেষণাগার তৈরি হল। বশী তার নাম দিলেন 'বিবেকানন্দ গবেষণাগার'।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে বশীর দেহত্যাগের পর কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর একটি চিঠি পাওয়া যায়। জীবনের ওই ভয়ংকর পরীক্ষার দিনগুলিতে গবেষণাগার আরম্ভ করার সময় তাঁর যে-প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা তা ওই চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে এবং শক্তি ও সাহসের জন্য স্বামীজীর কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা ও শরণাগতি ফুটে উঠেছে। বশী লিখছেন, ''স্বামীজী মহারাজ, আপনার নামে এই গবেষণাগার আরম্ভ করার সাহস করেছি। আমার কতটুকু শক্তি তা আপনার জানা আছে। আপনি আমার গুরু সদানন্দের পথনির্দেশক। আপনার কাছে আমার একটাই প্রার্থনা—আপনার আদর্শ সামনে রেখে এ কাজ আরম্ভ করেছি তা যেন সার্থক হয়। আমার আচার ব্যবহার আপনার নামে কলঙ্ক না আনে। আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যান। আমার যেন আপনার উপর ভালবাসা, বিশ্বাস থাকে সেই রকম করে দিন—ইতি বশী।''

বশী বাগবাজারে ৮ নং বোসপাড়া লেনে ওই পুরনো বাড়িতেই তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেন। স্বামীজীর কৃপা এবং নিজের অদম্য সাহসের উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে বশী সেটির সূচনা করেন। বন্ধুরা তাঁর কাজকর্মে আশ্চর্য হয়েছিলেন। বশীর স্নেহপরায়ণতা, হাসিখুশি স্বভাব, তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি স্বদেশে ও বিদেশে বিশিষ্ট বন্ধুবর্গকে আকর্ষণ করেছিল। এই গবেষণাকাজে যাঁরাই তাঁকে যৎসামান্য সাহায্য করেছেন, বশী আজীবন তাঁদের স্মরণ করেছেন। রাশিয়ার চিত্রকলাবিদ নিকোলাস রোয়েরিখ, স্বামীজীর অনুগামী জোসেফিন ম্যাকলাউড প্রমুখ অনেকেই তাঁকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছিলেন। ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি বশীকে আর্থিক সাহায্য করেছিল। এইসব কিছুর মধ্যেই বশী স্বামীজীর কৃপাস্পর্শ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে ধন্য হয়েছিলেন।

প্রথম আরম্ভ হওয়ার সময় ওই ছোট বাড়িতে খুব কষ্ট করেই কাজটি চালিয়ে যেতে হয়েছিল। গবেষণার জন্য আনা গাছগুলি রাখতে বড় জায়গা ও যথেষ্ট পরিমাণ আলোর দরকার ছিল। সেখানে কোনও টেবিল, চেয়ার ছিল না। তিনি চাকাওয়ালা দুটো কাঠের বাক্স তৈরি করেছিলেন যেটি সকালে টেবিলের কাজ করত। রাতে ওই বাক্সে গবেষণার জিনিসগুলি থাকত এবং ওই বাক্সটিই আবার বশীর খাটের কাজ করত। বাড়ির সিমেন্টের উঠোনে গাছগুলি রাখা হয়েছিল। বশীর পরিচিত আমেরিকার কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম. হার্টস এবং তাঁর ধনী পত্নী ডরোথি বশীকে এক বছর সবরকম সাহায্য করেছিলেন। এই দম্পতিই বিবেকানন্দ গবেষণাগারের সাহায্যকারীদের মধ্যে প্রথম। বশী উদ্ভিদের কোষের উপর গবেষণা আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর গবেষণাগারের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। *ক্রমশ*